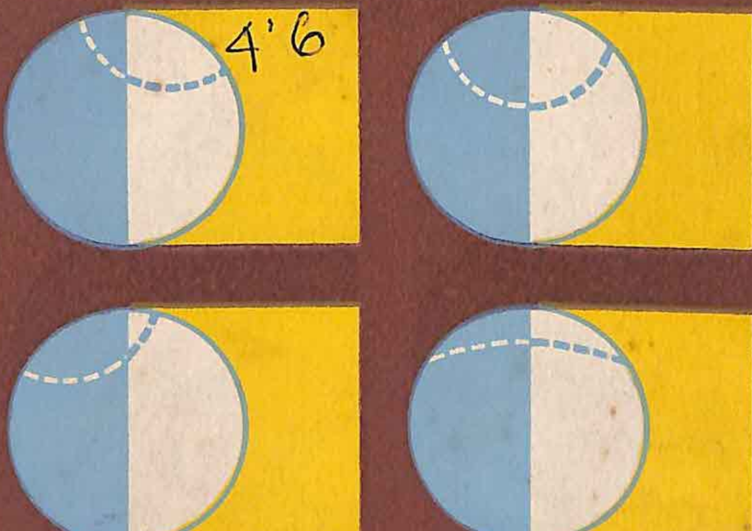
কেমন করে বছর ঘোরে

অরূপরতন ভট্টাচার্য



কেমন করে বছর ঘোরে

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ মুদ্রণ সংখ্যা—২২০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সমীর বিশ্বাস

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৫·০০

শীতকালে শীত কেন, গ্রীষ্মে গরম? শুধু তাই তো নয়, শীতের বেলা ছোট—এত ছোট যে তাকে প্রায় পাওয়াই যায় না আর গরমে সে বেলা বেড়ে যায়—এতটা বাড়ে যে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই যে শীত গ্রীষ্ম আর দিন রাত ছোট বড় হওয়ার খেলা বছর জুড়ে ছোটরা দেখে অথচ বুঝতে পারে না, তার কথাই ছোটদের মতন করে ছোটদের এই বইতে বলবার চেষ্টা করেছি।

আনন্দমোহন কলেজ
কলিকাতা ৭০০ ০০৯
১৮ অগাস্ট ১৯৮২

অরূপরতন ভট্টাচার্য

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান [রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯৭৬]
কার কেমন আকার
মাপের রকমফের
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়েরি
আকাশ চেনো
আমরা কেন আমাদের মতো দেখতে
রম্য গণিত
প্রাচীন ভারতে গণিত
পৃথিবীর বাইরে কি বুদ্ধিমান জীব আছে
বিজ্ঞানীর দপ্তর
গল্পে গল্পে বিজ্ঞান
নিউটন গেলেন আইনস্টাইন এলেন
কাঠি নিয়ে কঠিন খেলা
সংখ্যা নিয়ে অসংখ্য খেলা
বৈঠকী ধাঁধার খেলা
ধাঁধা নিয়ে মজার খেলা

এই সময়টা ভারি বিচ্ছিরি লাগে !

স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজার পরে আর কতটুকুই বা সময় পাওয়া যায় ? পিঠেতে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে এক ছুটে বাড়ি। বিকেলের জলখাবার, সে নিমেষে খেয়ে নিতে হবে।

মা বলবেন, বালাই ষাট, আস্তে খাও, বিষম লেগে যাবে যে !

কিন্তু আস্তে, বসে, রয়ে-সয়ে খেলে খেলবার জন্যে কি আর বিকেলটাকে পাওয়া যাবে ?

শীতের বিকেল ! সন্ধে এসে বসে পড়বে তার জায়গায়।

আর সন্ধে মানেই তো শাসন। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠলো, বাড়ি যাও, হাত পা ধোও। পড়তে বোসো !

শীতের বিকেলে যে সন্ধের বেশি দেরি থাকে না, আকাশের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।

চারিদিক কি রকম নরম, স্বপ্ন মাখানো, রূপকথার দেশের মত।

এ যেন ঠিক সূর্য ওঠার আগের সময়টুকু। আকাশের মাঝখান থেকে সরতে সরতে সূর্য এখন অনেক পশ্চিমে, দূরের নারকেল গাছের মাথাও পার হয়ে নেমে গিয়েছে।

গাছের ছায়া এখন কি লম্বা, আরও লম্বা হতে হতে যখন সে একেবারে মিলিয়ে যাবে, তখনই চারিদিক ঢাকা পড়ে যাবে অন্ধকারে।

এই জন্যে শীতকালের বিকেল ছোটদের ভাল লাগে না। অথচ গরমের দিনে! স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়েও কি রোদ! মনে হয় যেন শীতের শনিবারের হাফ-ডের পরে বাড়ি ফিরে আসছো।

কি লম্বা বিকেল!

সূর্য নারকেল গাছের মাথাই ছোঁয়নি এখনও। রূপকথার সেই ভাবতে ভাল-লাগা দেশটা গরমের দিনে স্কুল ফেরা বিকেলে কোথায়, কতদূরে কে জানে! গরমের দিনের বিকেল ছোটদের খুশি হওয়ার, না ফুরোনো অনেক সময়ের বিকেল।

কেন এরকম হয়?

শীতের বেলা ছোট, গরমে তার উল্টো? তখন দিন বড়। শুধু দিন বড় বললে সব বোঝায় না। সে দিন যেন শেষই হতে চায় না।

চারটেয় স্কুল ছুটি। বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে খেলার জন্যে তৈরি হতে আর কতক্ষণ?

বড় জোড় আধ ঘণ্টা।

তারপর চলল ছ'টা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত মাঠে দাপাদাপি, বল নিয়ে খেলা। ঘেমে, নেয়ে, উত্তেজনায় অস্থিরতায় একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

কত সময় যে পার হয়ে যায়, তবু তো আকাশে আলো থাকে। তবু তো অন্ধকার ঘন হয়ে যাওয়ার জন্যে আরও কিছু সময়ের দরকার হয়।

অথচ শীতের দিনে, সাড়ে ছ'টায় ! গরমের সঙ্গে তুলনায় তার কথা ভাবাই যায় না।

ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক বাল্ব, না হলে লোড শেডিংয়ে মোমবাতি বা হারিকেন অনেকক্ষণ জ্বলে গেছে।

মাথার উপরের আকাশে কত তারা। চারিদিকে তাকিয়ে এখন আর বিকেলকে কোনোদিকে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

ভাবতে অবাক লাগে না, গরমে যে দিন অনেক বড় থাকে, শীতে সেদিন কি ভাবে ছোট হয়ে আসে ?

এ একেবারে এক কোপ দিয়ে ছোট করে দেওয়া নয়—যেন একটা মস্ত গাছের ডাল, কাটারি চালালাম, কেটে দু ভাগ হয়ে গেল। এ ডাল একটু একটু করে ছোট হবে, সামান্য সামান্য করে। খুব অল্প কেটে বাদ দিলাম, আবার খুব অল্প কাটলাম, আবারও খুব অল্প।



এইভাবে রোজ কাটছো অল্প করে। কিন্তু এ রকম রোজ একটু একটু বাদ দিতে দিতে এক মাস, দু মাস, তিন

মাসের শেষে ডালটা কতটুকু হয়ে যাবে।

কিম্বা যদি এক বালতি, না, এক বালতি নয়, এক ড্রাম দুধের কথা বলি!

রোজ সেই ড্রাম থেকে এক হাতা দুধ তুলে নিচ্ছো। আজ নিলে তুলে এক হাতা। কাল আর এক হাতা। পরশু আবার এক হাতা।

এইভাবে রোজ যদি দুধ তুলে নেওয়া হয়, তাহলে কিছুদিন বাদে দেখবে ড্রামের দুধ বেশ কমে গেছে। অথচ একদিন এক হাতা তুললে কার সাধ্যি বোঝে যে, কাল যতটা দুধ ছিল আজ দুধ তার চেয়ে কম আছে।

গ্রীষ্মকালে খুব বড় দিনের পর সময় যখন একটু একটু করে পার হয়ে চলে, তখন আবার দিন ছোট হতে থাকে। ঘণ্টা, মিনিটে হিসেব দেওয়া লম্বা দিন থেকে যেন কটা করে মিনিট তুলে নেওয়া।

এমনিতে একদিনে কটা মিনিট তুলে নিলে পরের দিন বুঝবারই উপায় নেই যে দিন ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু এ রকমভাবে সরাতে সরাতে পরিমাণে যখন অনেক হয়ে যাবে, তখন ধরা তো পড়তেই হবে।

সন্দেশের প্যাকেট থেকে একটা সন্দেশ গেলে মা হয়তো বুঝতে পারেন না, কিন্তু পঁচিশটা সন্দেশের ভেতর থেকে চারটে কম পড়লে তখন কি আর কে সরিয়েছে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়?

লম্বা দিন ছোট হচ্ছে, ছোট রাত হয়ে যাচ্ছে বড়। দিন

রাত সবশুদ্ধ মিলে তো চব্বিশ ঘণ্টা, তাহলে একটা ছোট হলে আর একটা বড় না হয়ে তো উপায় নেই।

এক ভাঁড় দই যদি দুজনে মিলে খাও, তাহলে একজনের ভাগে কম পড়লে আর একজনের ভাগে বেশি পড়বেই। কিম্বা যার ভাগে কম পড়ছে সে যদি বেশি চায় তাহলে যে বেশি পাচ্ছে সে কম পাবেই। আর দুজনেই সমান সমান হলে বেশি কমের কথাই ওঠে না।

আমাদের দেশে দিন সবচেয়ে বড় থাকে কখন? যদি পুরো এক বছরের হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে দেখতে পাবে যে, দিন সবচেয়ে বড় থাকে জুন মাসে।

আর ২২ জুন এই দিক দিয়ে সকলের সেরা। সব থেকে দিন বড় হয় ওই তারিখটিতে। তাহলে ওই দিনে রাত সবচেয়ে ছোট।

তুমি কোথায় থাকো—পশ্চিমবাংলায়?

কোন্ শহরে?

এই রাজ্যের যে কোনো শহরেই তোমার বাড়ি হোক না কেন, বা যে কোনো জায়গায়, ওই তারিখটাতে তোমার অঞ্চলে দিন মাপে সবচেয়ে বড়।

সকালে সূর্য ওঠা থেকে সন্ধেয় সূর্য অস্তে নামা পর্যন্ত ঘণ্টা, মিনিটে যতটা সময় পার হয়, তেমন আর অন্য কোনো দিনেই নয়।

তুমি পশ্চিমবাংলায় না থাকলেও চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। দিনের বড় মাপের তারিখ এই বাংলার

বাইরেও বদলাবে না।

আমাদের ভারতের যে কোনো জায়গাতেই তুমি থাকো বা বেড়াতে যাও, উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে বোম্বাই পর্যন্ত যে কোনোখানে, যে কোনো শহরে, দেখতে পাবে এই দিনটিই বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দিন।

কিন্তু বড়দিন তো কেউ এই দিনটিকে বলে না। কি, তাই না?

কোন্ দিনটা সকলের কাছে বড়দিন, বলতে পারো? ডিসেম্বর মাস, স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন, হয়তো রেজাল্টও বেরিয়ে গেল, নতুন ক্লাসে ওঠার আনন্দে মশগুল।

চারদিকে কি কনকনে শীত, হিম মাখানো বাতাস। দুপুরের রোদটুকু একেবারে মায়ের আদরের মত। কিছুতেই ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

বিদেশী ক্রিকেটের দল এসেছে শহরে ক্রিকেট খেলতে। তুমি হয় রেডিওতে রিলে শুনছো না হলে টিভিতে খেলা দেখছো সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত।

এই রকম একটা সময়ে আসে সেই আনন্দের দিন, সেই হৈ হৈ রৈ রৈ করা দিন, ২৫ ডিসেম্বর। এই দিনটিকেই সবাই বড়দিন হিসেবে জানে।

কিন্তু ২৫ ডিসেম্বর কি সত্যিই দিন হিসেবে বড়?

সকালে রাত পোহানোর পরে যখন চারদিক ফরসা হয়

তখন থেকে সন্ধ্যায় চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া পর্যন্ত কতটা সময়? জুন মাসের না ফুরোনো বিকেলের মতনই কি ডিসেম্বরের বিকেল?

না, তা কক্ষনো নয়। এই সময়ের দিন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকার নেমে আসে। আর ডিসেম্বরে যখন বড়দিন, তখনকার কাছাকাছি তারিখে দিন সবচেয়ে ছোট থাকে।

তাহলে, অবাক হওয়ার কথা! দিন ছোট থাকার সময়ে কেন বড়দিন আসে?

আসলে ডিসেম্বরের শেষের দিকে দিন বড় হতে শুরু করে। ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর—এই তো সারা বছরের দিনের হিসেব। এর মধ্যে ২২ ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিন।

তাহলে রাত তখন সবচেয়ে বড়। তারপর ২৩ ডিসেম্বর থেকে ছোট দিন একটু একটু করে বড় হতে শুরু করে। দিন বড় বা বড় দিন হল।

এ কি রকম জানো?

বাড়িতে লোকজন এসেছেন কিম্বা তোমার কোনো আত্মীয়, তোমাকে দেখছেন বেশ কিছুদিন বাদে। কি বলবেন তোমাকে দেখে?

তুমি দেখছি বড় হয়ে গিয়েছো।

কি, তাই না?

মুখে বললেন, বড়।

আসলে বোঝাতে চাইলেন, তুমি ছোট ছিলে, বড়

হয়েছো। বড়দিনও সে রকম, দিন ছোট ছিল, বড় হচ্ছে।

তখন অন্ধকারের বদলে আলো, সে আসতে শুরু করেছে আমাদের কাছে বেশি সময়ের জন্যে।

এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে।

বড়দিনে দিন বড় হতে শুরু করেছে এই ভাবনায় যে মজা আর তার সঙ্গে যীশুখ্রীস্টের জন্ম, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

পৃথিবীর সব জায়গায়, সবখানেই কিন্তু ওই সময়ে দিন যে বড় হতে শুরু হয়েছে, তা নয়।

পৃথিবীর একভাগে দিন বড় হতে শুরু হলে অন্যভাগে দিন ছোট। যে ভাগে এখন দিন বড়, সে ভাগে আবার যখন দিন ছোট হবে, তখন অন্যভাগে দিন বড়।

এই যে দুটো ভাগ, এই দুটো ভাগে কিন্তু পৃথিবীকে হিসেব করে ভাগ করা হয়েছে।

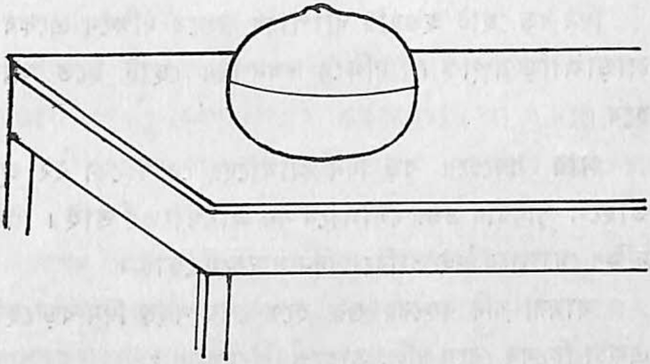
কিন্তু সে ভাগটা হল কি ভাবে ?

পৃথিবী যেন একটা কমলালেবু। এটাকে টেবিলের উপরে বসানো যাক। কমলালেবুর যে দিকটা টেবিলে লেগে রয়েছে সেটা বলি নীচের দিক বা দক্ষিণ দিক।

আর যে দিকটা টেবিলে লেগে নেই বা টেবিলের উপরে আছে সেটা উপরের দিক বা উত্তর দিক। এখন উপরের দিক বা উত্তরের দিকটা উপরের দিকেই থাক, নীচের দিক বা দক্ষিণের দিকটা দক্ষিণের দিকে।

কি ভাবে দুটো দিক আলাদা রাখা হবে ?

ঠিক কমলালেবুর মাঝখান দিয়ে একটা পেনসিল ঘুরিয়ে গেলেই চলবে। এই যে একটা দাগ পড়ল এই দাগটাই কমলালেবুটাকে ছুটো ভাগে ভাগ করে দিল।



সত্যিকার পৃথিবীর বেলায় এই রেখাটা তো পেনসিলে আঁকা যাবে না। পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে এই রেখাটা আঁকতে হবে মনে মনে। এই কল্পনার রেখাটাই পৃথিবীকে সমান ছুভাগে ভাগ করে রেখেছে।

এর একটা ভাগকে বলা হয়, উত্তর গোলার্ধ, অন্যটাকে, দক্ষিণ গোলার্ধ।

কোন্‌টা উত্তর গোলার্ধ আর কোন্‌টা দক্ষিণ গোলার্ধ তা নিশ্চয় বুঝতে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

ভারতবর্ষ কোন্ গোলার্ধে আছে বলতে পারো?

একটা গ্লোব নিয়ে বসলেই দেখতে পাবে আমাদের দেশটা পুরোপুরি রয়েছে উত্তর গোলার্ধে।

তাহলে ভারতবর্ষে যখন দিন বড় হতে শুরু করল, তখন উত্তর গোলার্ধের সব জায়গাতেই ওই রকমই—দিন বড় হতে শুরু করেছে।

দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তার উল্টো।

দিন বড় ছোট হওয়ার ব্যাপারে উত্তরে দক্ষিণে একেবারে আড়াআড়ি সম্পর্ক। দক্ষিণে তখন দিন ছোট হতে আরম্ভ হবে।

আর সবচেয়ে বড় দিন আমাদের দেশে তো ২২ জুন। তাহলে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে সব জায়গাতেই তাই। অথচ দক্ষিণ গোলার্ধে ওই তারিখে দিন সবচেয়ে ছোট।

আমরা যদি বছরের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দিন বড় ছোটর একটা হিসেব রেখে চলি, তাহলে কি দেখবো ?

কে বলতে পারে ?

বছর শুরু হওয়ার আগে দশটা দিনও নয়, সবচেয়ে ছোট দিনটি পার হয়ে যেতে হয় উত্তর গোলার্ধে। তারপর দিন একটু করে বাড়ে, রাত ছোট।

জানুয়ারির প্রথমেও সে রকম, ছোট দিন বড় হয়। কিন্তু তখনও বলবার মত কিছু নয়। তখনও বিকেল বেলাতেই সন্ধের অন্ধকার। রাতের আঁধার ভোর হলেও যেন আর কাটতে চায় না।

তারপর জানুয়ারি মাসও শেষ হওয়ার মুখে চলে আসে। ১৫, ২০, ২৫ তারিখও পার হয়ে যায়। ক্যালেণ্ডারেও মাস বদলের সময় ঘনায়। দিন আরও বড়, বুঝবার মত বড়, রাত

আরও ছোট, বোঝা যায় এমনভাবে ছোট।

ফেব্রুয়ারিতেও সেই ধারাটা সমানে চলে।

দিন বড়, তার মানে রাতের জমা সময়ে টান পড়ে। ফলে রাত ছোট হয়।

কতদিন পর্যন্ত এমন চলে ?

যতদিন না রাত আর দিন সময়ের হিসেবে সমান হয়। জানুয়ারি শেষ। ফেব্রুয়ারিও পার হয়ে গিয়ে আসে মার্চ মাস।

শুধু আসে বললে তো হবে না। দিন পার হয়ে চলে তার।

প্রথম পনেরোটা দিন। তারপর আরও প্রায় সাতটা দিন। মার্চের ২১ তারিখ। দিন রাত্রি সমান। তাহলে ২২ ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিনটির পরে দিন বড় হতে শুরু ক'রে ২১ মার্চ দিন রাত সমান।

এব পরে কি হবে ?

যত সময় পেরোবে দিন আরও বড় হবে। আরও রাত ছোট।

ডিসেম্বরে দিন একটু একটু করে বড় হতে শুরু করার পরে যেমন তিনটে মাস যায় দিন রাত সমান হওয়ার জন্যে, তেমনি মার্চের পরে আরও তিনটে মাস কাটাতে হয় সবচেয়ে বড় দিন আর রাত ছোটোর অপেক্ষায়।

তাহলে সেই আসে ২২ জুন অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিনটি।

সবচেয়ে বড় মানে আর বড় হওয়ার উপায় নেই। তাহলে

এর পরে কি হবে ?

যা হবে তা নিশ্চয়ই মনে মনে একটা আঁচ করতে পারছো। সবচেয়ে বড় দিন আর ছোট রাতের পরে কি হতে পারে ?

বড় দিন আর বড় থাকবে না। দিনের আলো যতটা সময় পর্যন্ত ছিল তার থেকে কম হতে শুরু করবে।

ছোট রাতও ছোট হতে হতে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে যাবে যার থেকে আর ছোট হওয়া যায় না।

এবারে তারও বড় হওয়ার পালা। দিন ছোট হতে আরম্ভ করবে। রাত বড়। বড় দিন থেকে সময় কেটে নিয়ে দেওয়া হবে রাতের সঙ্গে যোগ করে।

রোজই অল্প করে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত দিন আর রাতের হিসেবে কি দেখবে ?

বড় দিন আর ছোট রাতের পরে এবারে দিন আর রাত সমান। জুন মাসের পরে আরও তিনটে মাস যাবে এ জন্যে। ২৩ সেপ্টেম্বর। এই সময়ে দিন যতটা রাতও ততটা।

দিন যদি আরও কমতে থাকে তাহলে কি হবে ?

শেষ পর্যন্ত দিন সবচেয়ে ছোট আর রাত সবচেয়ে বড় হয়ে উঠবে। আরও তিন মাস যাবে এই ভাবে। ঘুরে আসবে ২২ ডিসেম্বর। সবচেয়ে বড় রাত আসবে, তাই ছোট দিনও সবার থেকে।

এই সে সারা বছর ধরে দিন রাতের ছোট বড় বা বড় ছোট হওয়া, এ যেন একটা পালার মত। দিন বড় হতে আরম্ভ হল তো হলোই, চলল কিছুদিন, রাত তখন ছোট হয়ে যাচ্ছে।

তারপর আবার পালা বদল হল। দিন ছোট, রাত বড়।

মেল, এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে নিশ্চয় কখনো না কখনো বাইরে বেড়াতে গেছো। ট্রেনে জানালার ধারে বসে আছো। বাইরে ইলেকট্রিক পোস্টে বাঁধা হয়ে তার চলে গেছে দূর থেকে আরও অনেক দূরে। কত দূরে তা কে জানে!

এই তারের দিকে তাকালে কি মনে হয়?

একটা পোস্ট পার হওয়ার পরে তারগুলো যেন নামতে শুরু করে। নামছে তো নামছেই, তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই কথাটা ভাবতে ইচ্ছে করে যে, এ নামা বোধহয় আর কোনোদিন শেষ হবে না।

চলন্ত ট্রেনে বসে দুটো পোস্টের মাঝের জায়গাটুকু পার হতে বা আর কতটুকু সময় লাগে! কিন্তু তার মধ্যেই এই সব ভাবনাগুলো খেলে যায় মাথার ভিতরে!

ভাবতে ভাবতেই দেখি, যে তারের নামা কোনোদিন বন্ধ হবে না বলে মনে করেছিলাম, সেই তার আর নামছে না, বরং এবার সে উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে। ট্রেন ছুটে চলেছে, তারও উঠছে তো উঠছেই। কেন জানি না, এবারেও মনে হয়, এ ওঠাও আর কোনোদিন বন্ধ হবে না। দেখতে খুব ইচ্ছে করে, কোথায়, কত উপরে এ উঠে যায়।

কিন্তু একটু বাদেই এ ওঠাও বন্ধ হয়। নতুন পোস্ট আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারের আবার নীচে নামা শুরু।

এই যে তারের একটু একটু করে নীচে নেমে যাওয়া, আবার যেই নীচে নামা শেষ হওয়া অমনি উপরে উঠে আসা, আবার

নীচে নামা, আবার উপরে ওঠা, এ যেন সারা বছরের দিন রাতের ছোট বড় হওয়ার হিসেব ধরে রেখেছে। তিনটি পোস্ট, তার মধ্যে দুবার করে তারের নামা ওঠা।

প্রথম দুটি পোস্টের মধ্যে ছ মাসের হিসেব, এখানে বড় দিন ছোট হচ্ছে বা উল্টোভাবে বলতে পারি, ছোট রাত বড়।

পরের দুটি পোস্টে বাকি ছ মাস। তখন দিন বড় বা রাত ছোট।



প্রথম পোস্ট থেকে নামার সময়ে বড় দিন ছোট বা রাত বড় হতে হতে যেই একেবারে নেমে আসা, অমনি দিন রাত সমান!

একই দুটি পোস্টের মধ্যে আবার যখন তার উপর দিকে উঠতে শুরু করে তখন রাত বাড়তে থাকে অর্থাৎ দিন আরও ছোট। পোস্টে এসে রাত সবচেয়ে বড়।

পরের দুটি পোস্টের মধ্যে বড় রাত আবার ছোট হতে থাকে, দিন বড়। যখন তারের মাঝামাঝি তখন দিনরাত সমান। তৃতীয় পোস্টের দিকে যাওয়ার সময়ে দিন আরও বড় হতে শুরু করে। তাই একেবারে তৃতীয় পোস্টে এসে দিন সবচেয়ে বড়। রাত ছোট।

কি, তাই না?

তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছো, ২২ জুন সবচেয়ে বড় দিন আর সবচেয়ে ছোট রাত পার হওয়ার পরে দিন রাত সমান হওয়ার দিকে এগিয়ে চলে। এর জন্যে অপেক্ষা করতে হয় আরও তিন মাস।

আসে ২৩ সেপ্টেম্বর।

দিন রাত সমান। এই দিন রাত বছরে তুমি আরও একবার সমান দেখতে পাবে। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে পাকা ছ'টি মাস।

শীত আসবে, শীত পার হবে। ২২ ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিনটি থাকবে এর মধ্যে। তারপর বছর ঘুরে নতুন বছর। ক্রমে ক্রমে এসে দেখা দেবে ২১ মার্চ। দিন আর রাত তখন সমান।

এই যে দিন রাত বড় ছোট বা সমান হওয়ার হিসেব, এ হিসেব কিন্তু উত্তর গোলার্ধের।

২১ মার্চ ঃ	দিন রাত সমান
২২ জুন ঃ	দিন সবচেয়ে বড় রাত সব থেকে ছোট
২৩ সেপ্টেম্বর ঃ	দিন রাত সমান
২২ ডিসেম্বর ঃ	দিন সবচেয়ে ছোট রাত সব থেকে বড়

উত্তর গোলার্ধের মতন দক্ষিণ গোলার্ধেও কি আমরা দিন রাতের একই রকম হালচাল দেখতে পাব?

২১ মার্চ, ২২ জুন, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২২ ডিসেম্বর তারিখগুলিতে

উত্তর গোলার্ধে যেমন, দক্ষিণ গোলার্ধে দিন রাতের হিসেব কি সেই রকমই ?

না, সব ক্ষেত্রে নয়।

কিন্তু কোথাও কোথাও মিল আছে। উত্তর গোলার্ধে যে তারিখ দুটিতে দিন রাত সমান, দক্ষিণ গোলার্ধে দিন রাত সমান ওই একই তারিখ দুটিতে। অর্থাৎ সেই ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।

আর দিন যে তারিখে উত্তর গোলার্ধে সব চেয়ে বড়, দক্ষিণ গোলার্ধে সেই তারিখে সব থেকে ছোট। তাহলে ২২ জুন দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সকলের চেয়ে ছোট। সে রকম দিন সব চেয়ে বড় হবে ২২ ডিসেম্বর যেদিন উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট সব থেকে।

তুমি যে শহরে থাকো, সেই শহরে বছরের বিভিন্ন সময়ে দিনের এই অদল বদল হওয়া দেখে তুমি অবাক হও না ?

কখনো দিন খুব ছোট, এত ছোট যে মন খারাপ হয়ে যায়, কখনো আবার ভীষণ বড়, এত বড় যে ভেবে শেষই করা যায় না। কখনো আবার দিন রাত সমান সমান।

কেন এ রকম হয় ?

শুধু দিন বড় হওয়া আর ছোট হওয়ার ব্যাপারটা নয়, সারা বছর যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দিন রাত বড় ছোট হওয়ার মত শীতে শীত আর গ্রীষ্মে গরমের ব্যাপারটাও সকলের নজরে আসবে।

আর দিন রাতের মত শীত গ্রীষ্মের আসা যাওয়াও কেন

একেবারে নিয়ম ধরে ?

বছর যখন শুরু হয় তখনকার কথা একবার মনে কর।

শীতের হাওয়ায় চারিদিকে কাঁপন লাগিয়ে দেয়। বেলা ছোট। অল্প সময়ের জন্যে রোদের তাপটুকু নিয়ে কি কাড়া-কাড়ি। কম্বল মুড়ি দিয়েও গা যেন গরম করে তোলা যায় না। জানুয়ারি মাস। বাংলায় পৌষ, মাঘ—পৌষ, মাঘ বললেই কেমন একটা শীত মাখানো সকাল-সন্ধের কথা মনে পড়ে যায়।

তাই না ?

তারপর মাস গড়ায়, শীতও আস্তে আস্তে কমে আসে। ফেব্রুয়ারি মাসও যায়।

আসে মার্চ মাস। মার্চ মাসে আর শীতের চিহ্ন মাত্র নেই। এই শহরে যে কোনোদিন শীত পড়ে, এখনকার প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তা কে বলবে ? অবশ্য গরমও খুব বেশি নয়।

তারপর আসে গ্রীষ্ম কাল। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারের এপ্রিল, মে আর জুনের কিছুটা। কি গরম, কি গরম !

খুব কষ্ট হয় তখন, তাই না ?

কিন্তু সেপ্টেম্বরে কি আর সে গরম থাকে ? বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের গরম তখন কেটে যায়। শীত অবশ্য তখনও পড়ে না। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই সময়ে বাংলায় পৌষ মাস। বছরের শেষ আর শুরু মিলে যায় শীতের ভেতর দিয়ে।

প্রতি বছরই এ রকম। প্রত্যেক বছরই সবাই তা দেখতে পাই। কোনো নড়চড় নেই। কোনো অদলবদল হয় না।

হয়তো কোনো বছর শীত বেশি পড়ে। কখনো আবার গরম তেমনভাবে নাও নামতে পারে। কিন্তু বছরের হিসেবে শীত গ্রীষ্মের সময়টুকু বাঁধা রয়ে গেছে।

কেন এ রকম হয়? কেন দিন কমে বাড়ে? দিন কমে বাড়ে মানে রাতের হিসেবও বদলায়।

সেই সঙ্গে কেন শীত গ্রীষ্ম আসে যায় নিয়ম ধরে? ভূমিকম্প হোক, প্লাবন বয়ে যাক, বাজ পড়ুক, তাতেও তো এর বদল হবে না।

কেন?

এই কেন'র উত্তর দিতে গেলে আগে পৃথিবীটাকে লক্ষ্য করতে হবে। পৃথিবীটা গোল। অনেকটা কমলালেবুর মত আগে বলেছি।

কমলালেবু গাছে ঝুলছে, সে নড়েও না, চড়েও না। পৃথিবীকে তো আর কেউ বেঁধে রাখেনি। নিজেই নিজের চারদিকে পাক খেয়ে খেয়ে সে ঘুরে চলেছে।

এই যে ছবিটা দেখেছো, এটা একটা গ্লোবের ছবি। গ্লোবের বাংলা ভূ-মণ্ডল। ভূ হল পৃথিবী আর মণ্ডল মানে গোল। গোল পৃথিবী ঠিক কি রকম এই ছবিটা দেখে নিশ্চয় সে কথা ভালভাবে বুঝতে পারছো।

কিন্তু গোল পৃথিবী কেন ফ্রেমে আটকানো আছে তেরচা-

ভাবে? উপরে আর নীচে যে দুটো বিন্দুতে পৃথিবী ধরা



পড়েছে, ফ্রেমের মধ্যে সেই দুটো বিন্দুই হল পৃথিবীতে সব চেয়ে উঁচু আর সবচেয়ে নীচু জায়গা।

নাম দুটো শুনেছো কি ?

উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। এখানে ফ্রেমে আঁটা পৃথিবীটা ঘুরে চলেছে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর ভেতর দিয়ে কল্পনায় আঁকা একটা রেখার উপরে ভর করে। এই রেখার নাম অক্ষরেখা বা বলা যায় পৃথিবীর মেরুদণ্ড, ইংরেজিতে বলা হয় axis।

এখন এই অক্ষের উপরে পৃথিবী রোজ একটা করে পাক দিচ্ছে। পাক দেওয়ার ফল দিন আর রাত্রি। যেদিকে দিন তার ঠিক উল্টোদিকে রাত্রি।



অন্ধকার ঘরে গ্লোবের উপরে একটা আলো ফেলো তো! গ্লোবের সবটুকুর উপরে কি আলো পড়ছে ?

না, তা তো পড়ছে না। শুধু টর্চের সামনে গ্লোবের যেটুকু আছে সেটুকুতেই আলো লাগছে। পিছনের অংশে পরিপূর্ণ

অন্ধকার। টর্চ যেন সূর্য, অন্ধকারে রাত্রি হচ্ছে আর আলোতে দিন। এই দিন রাত্রি বদলাচ্ছে পৃথিবী ঘুরে চলার সঙ্গে সঙ্গে।

ঘোরাও ফ্রেমে আঁটা পৃথিবীকে। না, যেমন তেমন ভাবে নয়, পশ্চিম থেকে পূর্বে।

তুমি নিশ্চয় অবাক হচ্ছো।

পশ্চিম থেকে পূর্বে, তা কেন হবে?

সূর্যকে তো আমরা সবাই দেখি, সে চলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ভোর বেলা পূর্ব আকাশে তার উদয়। যত বেলা বাড়তে থাকে, ততই সে উঠতে থাকে উপরের আকাশে। তারপর এক সময়ে মাথার উপরে; বেলা দুপুর।

কিন্তু মাথার উপরেও তো সে স্থির থাকে না। কোথাও তার দাঁড়িয়ে পড়ার জো নেই। সে নেমে যায় পশ্চিমে। দেখতে দেখতে বিকেল সন্ধে গড়িয়ে একেবারে সে চোখের আড়ালে।

এই যে সূর্যের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলা, তুমি নিশ্চয় ভাবছো, পৃথিবীও ঠিক চলে এইভাবে।

না, তা কিন্তু নয়।

আসলে পৃথিবীই চলেছে। আর সে চলা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। ঠিক সেই জন্যেই আমরা সূর্যকে দেখি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যেতে।

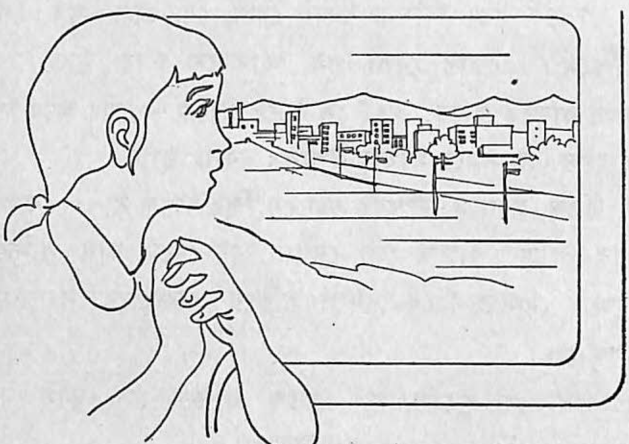
চলন্ত ট্রেনে বসে দেখোনি?

গাছ পালা, বাড়ি-ঘর, সব যেন চলেছে ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে ঠিক তার উল্টোদিকে। ট্রেন চলেছে হু হু করে ছুটে। বাড়ি-

ঘর-দোর সব পার হয়ে যাচ্ছে শাঁ শাঁ করে। বাড়ি-ঘর-দোর তো আর চলতে পারে না। সে তো মাটির উপরে তৈরি করা হয়েছে।

তাহলে?

তুমি বুঝতেই পারছো, তুমি যে গাড়িতে চড়েছো সেই গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে বলেই ওই রকম মনে হয়।



কিন্তু প্ল্যাটফরমের উল্টোমুখে যদি দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে?

ধরো তুমি তার একটাতে বসে আছো—এখন তোমার গাড়ি আগে ছেড়ে দিলে তুমি কি তা বুঝতে পারো?

তুমি ভাবো অন্য গাড়িটাই বুঝি ছেড়ে চলে গেল উল্টো-দিকে। প্রথমটায় কিছুই বোঝা যায় না। অথচ সেই

গাড়িটাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তার তখনও সিগন্যাল দেওয়া হয়নি।

তাহলে সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরছে না। পৃথিবীই ঘুরে চলেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। এইভাবেই রোজ তার পাক খাওয়া! এই ঘোরার ফলে কলকাতায় আগে সূর্য ওঠে তারপর বোম্বাইতে।

কারণ কলকাতা আছে বোম্বাই থেকে কিছুটা পূর্বদিকে। তাহলে কলকাতাতে আগে দিন, বোম্বাইতে পরে। সন্ধেও নামে কলকাতায় আগে।

কখনো লক্ষ্য করনি?

ক্রিকেট খেলা হচ্ছে বোম্বাই শহরে ব্রেবোর্ণ বা ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে। কলকাতায় বসে তার রিলে শুনছো। রিলে শুনতে শুনতে অন্ধকার হয়ে গেল। শুইচ অন করে আলো জ্বালালে বা হ্যারিকেন।

অথচ বোম্বাইয়ের স্টেডিয়ামে তখনও ঠিক খেলা চলেছে। একের পর এক ওভার বল হয়ে যাচ্ছে, ব্যাটসম্যানেরা সেই বল পিটিয়ে রান তুলছেন। ফিল্ডারেরা দৌড়ে গিয়ে ক্যাচ ধরছে, আম্পায়ার আঙ্গুল তুলে নির্দেশ দিচ্ছেন, হ্যাঁ, আউট।

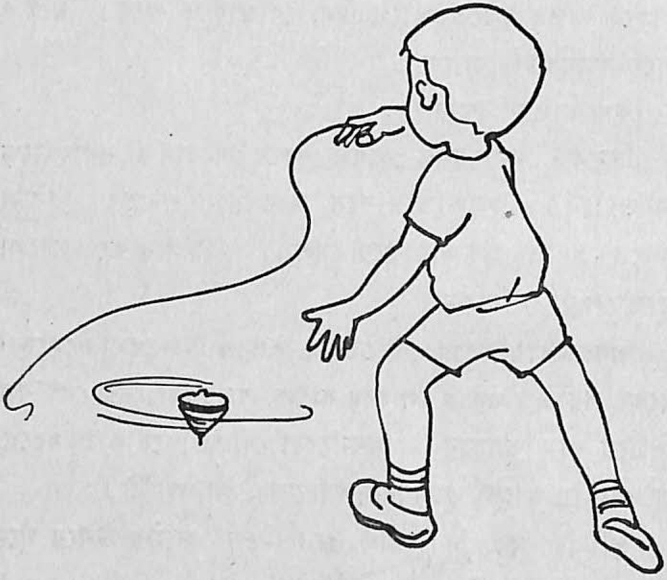
পৃথিবী তো দিন রাত এনে নিজের অক্ষের উপরে ঘুরে চলেছে, তা ছাড়া আরও একটা ঘোরা আছে পৃথিবীর। সেই ঘোরাটাই নিয়ে আসছে বছর বা দিন রাতের ছোট বড় হওয়া।

একসঙ্গে দুটো ঘোরা?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

তোমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, সেটা আবার কি রকম ব্যাপার? নিজের অক্ষের উপরে পাক তো খাচ্ছেই তা ছাড়া সে আরও একটা ঘোরা ঘুরে চলেছে এক বছর ধরে। এও কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়?



কখনো তুমি লাট্টু ঘুরিয়েছো কি? যেই লাট্টু লেত্তির বাঁধন ছাড়িয়ে মাটিতে এসে আছড়ে পড়ল, অমনি তার ঘোরা শুরু। নিজের চারদিকে তো সে ঘুরে চলেইছে। কিন্তু সে ঘোরাই

সব ঘোরা নয়। সে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সে সরে সরেও যাচ্ছে। এই সরা যদি একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে হতো, নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সে পরিষ্কার একটা পথ ধরে সরে চলেছে, সরে চলেছে, এইভাবে সরে সরে, সে আরও একটা ঘোরা শেষ করে ফেললো, তাহলে সেই ঘোরাটাকে পৃথিবীর সারা বছরের ঘোরার সঙ্গে তুলনা করা যেত।

নিজের চারদিকে পৃথিবী পাক খাচ্ছে, একটা পাকে এক দিন আর এক রাত্রি। আর এই পাক খেতে খেতে সরে সরে গিয়ে যখন সে আর একটা ঘোরা শেষ করে তখন তার একটা বছর হয়।

লাট্টুকে ঘোরানো যায়, ভাল করে লাট্টু ঘোরালে নিজের চারদিকে সে অনেকক্ষণ ঘুরতে পারে, সরে সরেও যায়, কিন্তু সে সরাটা তোমার ইচ্ছে মতো একটা ঘেরা পথে নয়।

তা ছাড়া সূর্যই বা কোথায় এখানে?

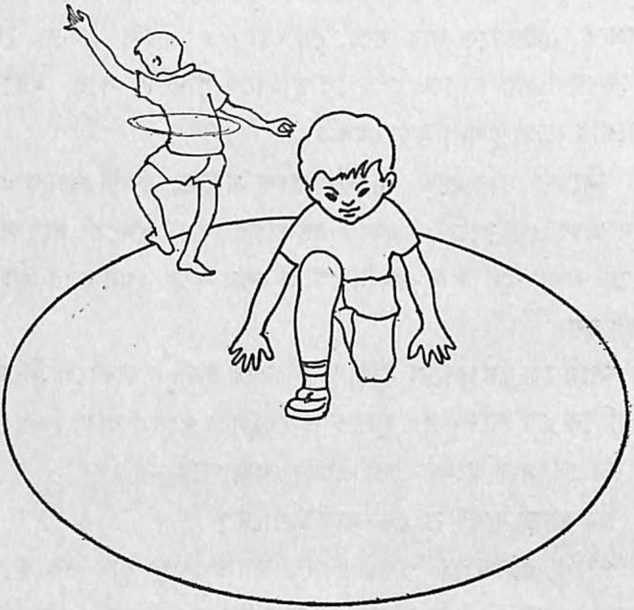
পথটা একেবারে পৃথিবীর মত করার জন্যে তুমি এক কাজ করতে পারো। তুমি নিজে একটা প্রায় গোল পথে দৌড়োতে শুরু করো।

চক দিয়ে একটা প্রায় গোল পথ এঁকে নাও। এই পথটার ঠিক মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখো তোমার ছোট ভাইকে। সে যেন সূর্য। তুমি তাকে ঘুরে চলো।

না, এক দৌড়ে ঘুরে চললে হবে না। তুমি নিজে নিজের চারদিকে ঘুরবে, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলবে। হয়তো একটু বেশি ঘুরতে হচ্ছে তোমাকে। কিন্তু পৃথিবী যে ঠিক কি ভাবে

সূর্যকে ঘিরে ঘুরে চলে এবারে নিশ্চয় তা বুঝতে পারবে।

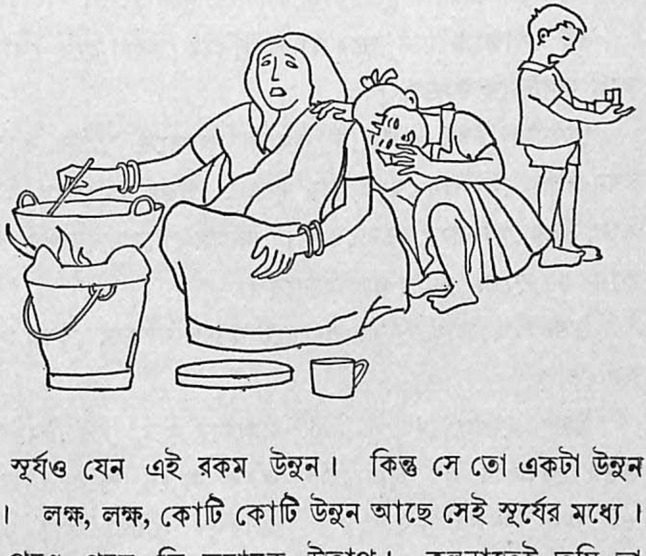
পৃথিবীর ঘোরাটা তো বোঝা গেল। কিন্তু এই ঘোরার



সময়ে কেন কখনো দিন বড়, রাত ছোট বা কখনো শীত পড়ে বা গরম নামে ?

উনুনে আগুন গন গন করছে। মা তোমাকে কক্ষনো সেই উনুনের কাছে একা যেতে দেন না, কিন্তু তুমি যদি কোনোদিন মার সঙ্গে সঙ্গে যাও মার হাত ধরে, তাহলে নিশ্চয় উনুনের তাপ তোমার গায়ে এসে লাগবে।

উঃ, কি গরম ! বেশি কাছে যায় কার সাধ্যি ? মা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি তার থেকে একটু দূরে দাঁড়ালে। ধরো তোমার বোন এসে গেল সে সময়ে। এগিয়ে গেল সে মায়ের কাছে। তাহলে তার গায়ে গরম লাগবে তোমার চেয়ে বেশি। কিন্তু যদি সে পিছিয়ে থাকতো তোমার চেয়ে, তাহলে উনুনের আঁচ এসে পৌঁছোতো অল্প। উনুনের আঁচের জোর কত তা সে বুঝতেই পারতো না।



সূর্যও যেন এই রকম উনুন। কিন্তু সে তো একটা উনুন নয়। লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি উনুন আছে সেই সূর্যের মধ্যে। কি প্রচণ্ড গরম, কি ভয়ানক উত্তাপ! কল্পনাতেই তুমি তা আনতে পারবে না। এই সূর্যের কাছাকাছি যারা থাকবে, তাদের যত বেশি গরম লাগবে, দূরের লোকের ততটা গরম লাগার কথা নয়।

তুমি তো জানো পৃথিবীকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি। একটা উত্তরের ভাগ আর একটা দক্ষিণের অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ।

আমাদের পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের উপরে এমন তেরচাভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘুরে চলে যে, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ সব সময়ে সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে না। লাট্টুর ঘোরাও অনেকটা এই রকমই। সেও তার নিজের হুলের উপরে সোজা হয়ে না ঘুরে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘুরে চলে।

এই সোজা হয়ে না ঘুরে ঘাড় বাঁকিয়ে তেরচা হয়ে ঘোরার জন্যে ফলটা কি দাঁড়ায়?

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ কখনো আসছে সূর্যের কাছে। তখন দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে যায় দূরে। উত্তর গোলার্ধ কাছে এলে উত্তর গোলার্ধে গরম বেশি। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীত, কারণ সে সূর্যের থেকে দূরে রয়েছে।

উত্তর গোলার্ধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকবে কোন্ সময়ে বল তো?

উত্তর গোলার্ধে যে দিনটি সবচেয়ে বড়, সেই দিনটিতেই উত্তর গোলার্ধ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে আছে সূর্যের দিকে। ওই দিন নিশ্চয়ই ২২ জুন। তারপর পৃথিবী তার চলার পথে একটু একটু করে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর মেরুদণ্ডের তেরচাভাব যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে।

তাহলে চলতে চলতে এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে

যখন সূর্য থেকে পৃথিবীর উত্তর দিক আর দূরে থাকবে না বা দক্ষিণ দিক কাছে। তখন সূর্য থেকে দুই দিকের দূরত্বই সমান হয়ে যাবে।

তুমি হয়তো ভাবছো, তা কি কখনো সম্ভব? কেমন করে হবে তা?

ঠিক আছে, তুমি নিজে একটা প্রায় গোল ঘর কাটো খড়ি দিয়ে। এবার তুমি দাগ কাটা ঘরের যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াও। হাতে একটা লাঠি।

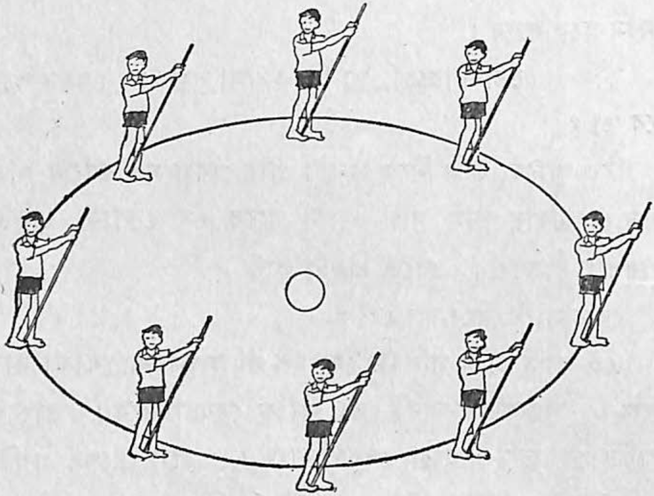
কেন লাঠি নেবে বল তো?

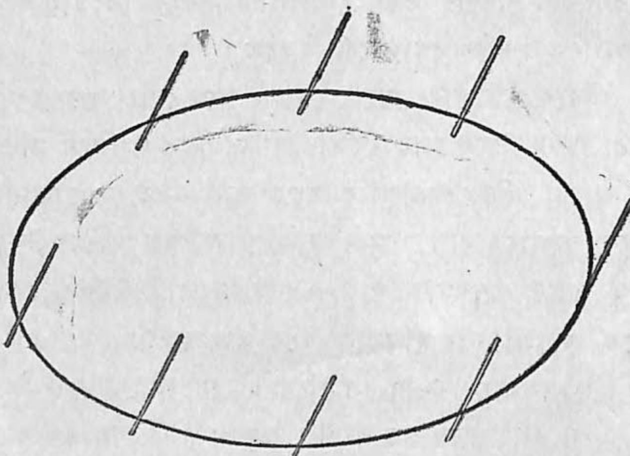
এই লাঠি নেবে পৃথিবীর মেরুদণ্ড বা অক্ষরেখা বোঝানোর জন্যে। পৃথিবীর মেরুদণ্ড তো আছে তেরচাভাবে। তাহলে লাঠিটাকে তুমিও ধরো তেরচাভাবে। মনে রেখো, লাঠির উপর দিকটা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের দিককে বোঝায় আর নীচের দিকটা দক্ষিণ গোলার্ধের দিককে।

এইবার তোমার প্রায় গোল পথে ঘোরা শুরু হবে। ঘোরা শুরুর আগে আর একবার লাঠির দিকে তাকিয়ে নাও। ধরে আছো তুমি, তেরচাভাবে আছে লাঠি—এই তেরচাভাবটা কখনো বদলাবে না। আর তুমি গোল ঘেরা দাগের উপরে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াও যেখানে লাঠির উপর দিকটা থাকে ঘেরা জায়গার মাঝখান থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে।

এই মাঝখানে একটা বল রাখো। সেটাই যেন সূর্য।

এখন তুমি ঘুরতে শুরু করো। দেখো লাঠি যেন একটুও না এদিক ওদিক নড়ে যায়। ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের হাতে ধরা বাঁশীর





মতন সে লাঠিও তোমার হাতে শোভা পাবে! তোমাকে নিজেকে ঘোরাতে হয় তো ঘোরাও, শরীর মুখ বাঁকাতে হয় তো বাঁকাও। কিন্তু লাঠি যেমন ভাবে যেদিকে মুখ করে ধরা ছিল ঠিক তেমনিভাবেই ধরা থাকবে।

চলতে শুরু করে তুমি কতদূর যাবে ?

হ্যাঁ, পুরো পথটাই তোমাকে ঘুরতে হবে। আর না থেমে, একেবারে ঘুরে যাবে। কিন্তু ঘোরার সময়ে একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করবে। লাঠির উপরের দিকটা বল থেকে আর আগের মতন দূরে নেই। গোল ঘেরা পথের চার ভাগের এক ভাগ এলেই বুঝতে পারবে যে, উপর দিকটা যত দূরে আছে নীচের দিকটাও আছে ঠিক তত দূরে। এ দূরে, ও কাছে বা এ কাছে ও দূরে এমন নয়।

চার ভাগের এক ভাগ কতটা পথ বুঝতে পারলে কি? একটা বড় দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাও। ঘড়ির বড় কাঁটা ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত আসতে যতটা পথ চলে, তাই হলো সমস্ত চলার পথের চার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

কি, তাই না ?

সমস্ত পথটা তো বারোটা থেকে শুরু করে আবার ১২টা পর্যন্ত ঘুরে আসা। সমান চার ভাগে ভাগ করা যায় পথটাকে। ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত তো বটেই, সে রকমভাবে ৩টে থেকে ৬টা, ৬টা থেকে ৯টা বা আবার ৯টা থেকে বারোটা। ১২টায় শুরু করে ৩টে পর্যন্ত এলে যেমন চার ভাগের এক ভাগ পথ পার হওয়া যায়, তেমনি ৬টা পর্যন্ত গেলে

অর্ধেক পথ, ৯টা পর্যন্ত চার ভাগের তিন ভাগ আর ১২টায় ফিরে এলে পুরো পথটাই ঘোরা হল।

চার ভাগের এক ভাগ পথ পার হওয়ার পরে যখন লাঠির উপর আর নীচের দিক, সূর্য বোঝানোর জন্যে যে বল রয়েছে তা থেকে সমান দূরে, তখন এল ২৩ সেপ্টেম্বর। বলটা মাটিতে না বসিয়ে একটা গোল টেবিলের ওপরে বসালে লাঠির দুটো দিক বল থেকে সমান দূরে থাকাটা আরও ভাল করে বুঝতে পারতে।

তুমি পথ চলতে শুরু করেছিলে ২২ জুন—উত্তর দিক যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে।

অর্ধেক পথ তাহলে পার হবে কবে ?

নিশ্চয় অর্ধেক পথ পেরিয়ে যাবে ২২ ডিসেম্বর। ২৩ সেপ্টেম্বর লাঠির উত্তর আর দক্ষিণ দিক ছিল গোল বল থেকে সমান দূরে। ২২ ডিসেম্বর অবস্থাটা আবার বদলে যাবে।

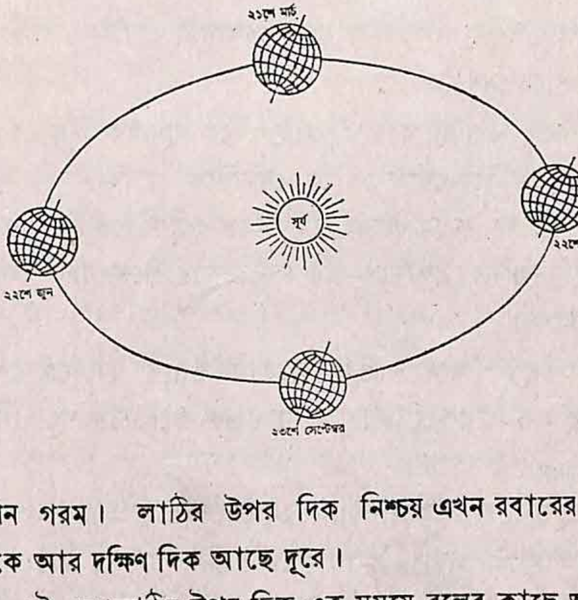
কি হবে ?

তখন দেখো লাঠির চেহারা ২২ জুনের ঠিক উল্টো। উত্তর দিকের বদলে দক্ষিণ দিক বা লাঠির নীচের দিক এগিয়ে এসেছে বলের কাছে। উত্তর দিক সরে গেছে দূরে। তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গরম আর উত্তর গোলার্ধে শীত। তুমি আরও ঘুরে চলো। আরও তিনটে মাস যাক। সবশুদ্ধ চার ভাগের তিন ভাগ পথ পার হয়ে গেলে।

আসবে ২১ মার্চ। লাঠির উপর আর নীচের দিক রবারের বল থেকে সমান দূরে আছে। এ সেই ২৩ সেপ্টেম্বরের অবস্থা।

তখন সবদিকেই উত্তাপ সমান। বা কোনোদিকেই উত্তাপ খুব একটা বেশি নয়। গোল পথের যে অংশটুকু এখনও ঘোরা বাকি আছে সেটুকু চলে এলেই তোমার ঘোরা শেষ হবে।

আবার তুমি পৌঁছে যাচ্ছো ২২ জুন। উত্তর গোলার্ধে



তখন গরম। লাঠির উপর দিক নিশ্চয় এখন রবারের বলের দিকে আর দক্ষিণ দিক আছে দূরে।

এই যে লাঠির উপর দিক এক সময়ে বলের কাছে আসছে আর এক সময়ে নীচের দিক বা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ কখনো সূর্যের কাছে আর কখনো দক্ষিণ গোলার্ধ, সারা বছর আকাশে সূর্যকে লক্ষ্য করলেও আমরা তা দেখতে পাবো।

তুমি নিশ্চয় অবাক হচ্ছো। পৃথিবী সূর্যের দিকে সরে

আসবে তা বুঝবো কি করে ?

না, পৃথিবীর সূর্যের দিকে সরে আসা বোঝে কার সাধ্যি, কিন্তু প্রত্যহ সূর্যকে লক্ষ্য করলে দেখবে, সে রোজ এক জায়গায় ওঠে না।

তুমি বলবে, সূর্যের উদয় হয় পূর্বে।

হ্যাঁ, সে কথা ঠিক।

কিন্তু পূর্বদিক বলতে আসলে যেখানটা বোঝায়, সূর্য কি রোজ ভোরে সেখানে থাকে ?

বাড়িতে দাদা বা বাবার কাছ থেকে পূর্বদিক ঠিক কোন্‌-খানটা জেনে নিয়ে রোজ ভোরে সেইদিকে তাকিয়ে থেকো। দেখবে, ডিমের কুসুম রংয়ের সূর্য উঠছে বরাবর পূর্ব দিকে নয়। গ্রীষ্মের দিনগুলিতে সে সরে যায় উত্তরে আর শীতের দিনগুলিতে দক্ষিণ দিকে।

এই উত্তর দক্ষিণে যাওয়া আসায় উত্তরে সবচেয়ে বেশি সরে ২২ জুন, তারপরে ফিরে আসতে শুরু করে, ঠিক পুর্বে ফিরে আসে ২৩ সেপ্টেম্বরে।

এবারে তার দক্ষিণে সরা। ২২ ডিসেম্বর তার চলার পথের চূড়ান্ত দক্ষিণে, তারপর আবার ফেরে ঠিক পূর্বে ২১ মার্চ।

এই যে সূর্যের একবার উত্তরে সরে যাওয়া আর একবার দক্ষিণে, এ যেন একটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের যাতায়াতের মত।

পেণ্ডুলামওলা যে কোনো দেওয়াল ঘড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি দেখি ?

যদি প্রথম শুরু ধরি মাঝখান থেকে, তাহলে নজরে আসে,

হয় পেণ্ডুলাম ঘড়ির বাঁ দিকে যেতে শুরু করল না হয় ডান-দিকে।

ধরে নিই, প্রথম তার বাঁ দিকে যাওয়াটাই দেখতে পেলাম।

তাহলে সবশুদ্ধ যাতায়াতের হিসেবটা কি রকমের?

মাঝখান থেকে সে যাচ্ছে বাঁয়ে, তারপর ফিরে আসছে মাঝে, তারপর ডাইনে—যতটুকু যাওয়া যায়, এরপর আবার মাঝখানে।

কিন্তু এই মাঝখানেই তো শেষ নয়। এইখানেই যেমন পেণ্ডুলাম থমকে দাঁড়ায় না, তার যাতায়াত সমানে চলে, পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের বেলাতেও তাই।

পেণ্ডুলামের যাতায়াতের ভেতর দিয়ে আমরা দেওয়াল ঘড়িতে সাধারণভাবে পাই সেকেণ্ডের হিসেব। মাঝখান থেকে চলতে শুরু করা, বাঁয়ে যাওয়া আবার মাঝে আসা বা মাঝখান থেকে ডাইনে ফেরা, ঘুরে আসা আবার মাঝখানটিতে বা একেবারে বাঁ থেকে ডাইনে বা ডাইনে থেকে বাঁয়ে—এই এতটা যাতায়াতে যতটা সময় লাগে, তাই হল একটা সেকেণ্ড।

সূর্যের এই রকম যাতায়াতে আমরা সেই রকম পাই পুরো একটা বছরের মাপ।

সূর্যের এই যে একবার দক্ষিণ দিকে সরা আর একবার উত্তর দিকে সরে যাওয়া—এই সরে যাওয়া মানে ঠিক কতটা?

তার উত্তর দিতে গেলে আগে বিষুবরেখাটার কথা বলে নিতে হবে।

উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে সমান দূরে ঠিক পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে আঁকা যে রেখাটা পৃথিবীকে সমান ছু ভাগে ভাগ করে রেখেছে, সেই রেখাটার নাম বিষুবরেখা।

এই বিষুবরেখার সামান্য উত্তর দিয়ে এই রকম আর একটা গোল রেখা টানি।

সামান্য উত্তর দিয়ে মানে?

বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত দূরত্বকে যদি সমান দূরে আঁকা ৯০টা রেখা দিয়ে ভাগ করো, তাহলে পর পর ছুটো রেখার মধ্যের দূরত্ব কি বেশি হয়?

না, বেশি তো কক্ষনো নয়।

অঙ্কের ভাষায় পর পর ছুটি রেখার মধ্যের দূরত্ব যদি হিসেব করি, তাহলে সে দূরত্বকে বলবো মাত্র ১ ডিগরি।

এই যে রেখাগুলোর কথা বলছি, বুঝতেই পারছো, এই রেখাগুলো আসলে আঁকা নয়, কল্পনার রেখা।

এত বড় পৃথিবী, মানুষের ক্ষমতা কি, এর উপরে চক বা পেনসিল দিয়ে সত্যিকারের রেখা এঁকে যায়?

তাহলে বিষুবরেখা থেকে উত্তরে একটা রেখা পর্যন্ত এক ডিগরি, ছুটো রেখা পর্যন্ত ছু ডিগরি, তিনটে রেখা পর্যন্ত তিন ডিগরি।

এইভাবে তুমি বিষুবরেখা থেকে উত্তরে যতগুলি রেখা পার হবে, ডিগরির হিসেবে তুমি যাচ্ছো ততটুকু দূরত্বই—তাহলে তিনটে রেখা পার হলে তিন ডিগরি, দশটা রেখা পার হলে দশ

ডিগরি, পঁচিশটা রেখা পার হলে পঁচিশ ডিগরি।

শুধু বিষুবরেখা থেকে উত্তরে নয়, উত্তরের বেলাতে যে রকম, দক্ষিণের বেলাতেও ঠিক সেই রকমই।

কারণ বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু যতটা দূরে, দক্ষিণ মেরু দূরত্বে ঠিক ততটুকুই। ফলে সেদিকটাও ভাগ হবে ৯০টা সমান অংশে।

নিশ্চয় বুঝতে পারছো, সমান অংশের প্রত্যেকটা অংশই এক ডিগরির সমান।

বলতে পারো, সূর্যকে যে পেণ্ডুলামের মত বিষুবরেখা থেকে উত্তর দক্ষিণে যেতে দেখি, যাচ্ছে সে কতটা ?

সে যায় ২৩টা রেখা পার হয়ে আরও একটা রেখার অর্ধেকটা পর্যন্ত অর্থাৎ মোট সাড়ে ২৩ ডিগরি। উত্তরেও যা, দক্ষিণেও তা। তার চেয়ে বেশি উত্তরে বা দক্ষিণে সূর্যের যাওয়া নিষেধ।

তাহলে সূর্যের এই যাতায়াতের পথের মধ্যে যত দেশ আর যত মানুষ, বছরে তাদের মাথার উপরে মাত্র হুবার করে সূর্য আসবে—একবার সূর্যের উত্তরে যাওয়ার সময়ে আর একবার সূর্য যখন উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে নামবে।

বল দেখি ?

আমাদের কলকাতার মাথার উপরে আমরা কি কখনো সূর্যকে দেখতে পাবো ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

কারণ বিষুবরেখা থেকে উত্তর দক্ষিণে সূর্য যতটা যায়, কলকাতা আছে তার ভেতরেই।

বিষুবরেখা থেকে কোন্ দিকে আর কতদূরে কলকাতা আছে বলতে পারো ?

তুমি কি ম্যাপ দেখতে পারো ?

যদি না পারো, তাহলে দাদা দিদি কাউকে বোলো, তোমাকে ম্যাপ দেখিয়ে দিতে।

তুমি দেখবে, উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধের পৃথিবীকে যে বিষুবরেখা সমান ছু ভাগে ভাগ করে রেখেছে কলকাতা আছে তার উত্তর গোলার্ধে। আর বিষুবরেখা থেকে তার দূরত্ব মাপো। দেখবে সে আছে সাড়ে বাইশ ডিগরি উপরে।

তাহলে কলকাতার মাথায় সূর্য আসছে বছরে ছুবার। কিন্তু কলকাতা থেকে আরও, আরও যদি উত্তরে সরে যাও, তাহলে সূর্যকে আর কখনো ঠিক মাথার উপরে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

খেলার মাঠের যেমন একটা সীমা থাকে যার বাইরে প্লেয়াররা যেতে পারে না, তেমনি সূর্যেরও উত্তরে যাওয়ার একটা সীমা আছে। উত্তরে সে সীমা আছে বিষুবরেখা থেকে সাড়ে তেইশ ডিগরি উপরে। তার ওপারে আর সূর্যের যাওয়া চলে না।

এই যে বিষুবরেখা থেকে সাড়ে তেইশ ডিগরি উত্তর দিয়ে সূর্যের চলার একটা সীমারেখা আঁকা হয়েছে পৃথিবীকে ঘিরে, এই রেখাটির একটা নাম আছে। তা হল কর্কটক্রান্তি। ইংরেজিতে একে আমরা বলি Tropic of Cancer।

কর্কটক্রান্তি বিষুবরেখা থেকে উত্তরে যতদূরে, দক্ষিণে বিষুব-

রেখা থেকে ঠিক ততটা দূরে কর্কটক্রান্তির মত আর একটা রেখা গেছে। তার নাম মকরক্রান্তি। ইংরেজিতে একে বলা হয় Tropic of Capricorn।

এই মকরক্রান্তি হল সূর্যের দক্ষিণ সীমা। সূর্য এর দক্ষিণেও যেতে পারবে না।

তাহলে বিষুবরেখাকে ঘিরে কর্কটক্রান্তি আর মকরক্রান্তির বাইরে যত রেখা আছে, সেই সব জায়গায় সূর্য কখনো মাথার উপরে আসে না, আসবেও না।

উত্তরে জাপানের কথা ধর, দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড।

এই সব জায়গায় সূর্যকে কি কখনো দেখতে পাবে মাথার উপরের আকাশে?

কি মনে হয় তোমার?

না, কক্ষনো নয়।

তাহলে কর্কটক্রান্তি আর মকরক্রান্তি—উত্তর দক্ষিণে এই দুই সীমারেখার মধ্যে যাওয়া আসায় সূর্য যখন মাথার উপর দিয়ে চলে তখনই তার তাপটা সরাসরি এসে গায়ে লাগে। কিন্তু সূর্য যখন কিরণ দেয় তেরচাভাবে তখন কি আর ততটা গরম মনে হয়?

আমরা সবাই উত্তর গোলার্ধের লোক। গ্রীষ্মের দিনগুলিতে সূর্য উত্তর গোলার্ধে কিরণ দেয় সরাসরি, দক্ষিণ গোলার্ধে নয়। আর এই সরাসরি কিরণ দেওয়ার ফল কি হয়, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।

মনে কর, অন্ধকারে অনেক লোক আসছে মাঠের উপর

দিয়ে। টর্চ জ্বালালে তুমি। টর্চের সামনে যে আছে তার উপরে যতটা আলো পড়বে, পাশে যারা আছে, তারা কি ততটা আলো পাবে ?

সূর্যের বেলাতেও সেই কথা। সরাসরি সামনে যে আছে তার উপরে রোদ যতটা প্রখর হয়ে পড়ে, অন্যের উপরে ততটা নয়। প্রখর রোদ মানে গরম আরও বেশি।

তাহলে কোথাও গরম বেশি হওয়ার জন্যে সূর্য কাছে আছে না দূরে সেটা যেমন দেখতে হবে, তেমনি দেখতে হবে সূর্যের আলো কি রকম ভাবে এসে পড়বে। তার মানে সোজাসুজি-না বাঁকাভাবে।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে শুধু গরম বেশি পড়ে বা শীতকালে শীত তা তো নয়, গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয় বা রাত ছোট আর শীতকালে তার উল্টো।

কেন ?

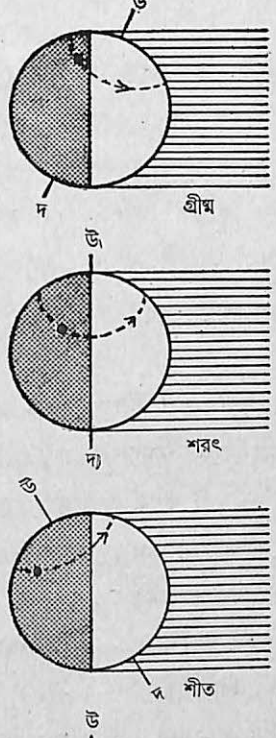
এই বড় ছোট হওয়ার মধ্যে যেন অনেক তফাৎ। আর তা ছাড়া বছরের দুটো তারিখে দিন আর রাত একেবারে সমান।

ভাবলে অবাক লাগে না ?

প্রতি বছর এ হবেই। কখনো এর হেরফের নজরে আসে না।

গ্রীষ্মের দিনগুলোর কথাই আগে ধরা যাক। সূর্যের দিকে উত্তর গোলার্ধ হেলে আছে। যতটুকুতে আলো এসে পড়ছে ততটুকুতে দিন, বাকি রাত্তির।

এখন আলো এসে পড়ছে কতটুকু জায়গায় ?


উ
দ
গ্রীষ্ম
উ
দ
শরৎ
উ
দ
শীত
উ
দ
বসন্ত

উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেঁকে থাকায় উত্তর গোলার্ধে যতটুকু জায়গা আলো পাচ্ছে একসঙ্গে, ততটা জায়গা কিন্তু অন্ধকারে নেই।

ধরো তুমি আছো কলকাতায় বসে। পৃথিবী তো তার মেরুদণ্ডের উপরে পাক খেয়ে রোজ দিন আর রাত নিয়ে আসছে। কলকাতাও ঘুরে চলেছে এই ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে! এই ঘোরার সময়ে দিনের আলো সে যতটা পাচ্ছে রাতের অন্ধকার ততটা নয়। তাই গ্রীষ্মে উত্তর গোলার্ধে দিন বড়, রাত ছোট। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক এর উল্টো। সেখানে দিন ছোট, রাত বড়।

আবার গ্রীষ্মে যেমন হয়, শীতে তেমন নয়। শীতের সময়ে উত্তর গোলার্ধে আমাদের দেশেই যে কোনো একটা জায়গার কথা ধর। দেখবে পৃথিবী যখন নিজের মেরুদণ্ডের উপরে পাক খেয়ে দিন রাত নিয়ে আসে, তখন কোনো একটা জায়গা দিনের আলোয় যতটা থাকে, রাতের অন্ধকারে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি সময়ের জন্যে। আমাদের উত্তর গোলার্ধে শীতকালে তাই রাত বড়।

আর মার্চ বা সেপ্টেম্বরের কথা আলাদা।

তখন কি হয়?

তখন গ্রীষ্মও নয়, শীতও নয়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ, দুই গোলার্ধই তখন সূর্য থেকে সমান দূরে। আগে শুধু উত্তর গোলার্ধের কথা ধর। দিনের আলো তাই উত্তরে আমাদের দেশে যে কোনো জায়গায় যতক্ষণ, রাতের

অন্ধকারও ঠিক ততক্ষণ। দিন রাত সমান। দক্ষিণ গোলার্ধেও ও রকম। যতটুকু দিন ততটুকু রাত।

আমরা দেখি শীতের শেষে বসন্ত আসে। মার্চ মাস বসন্ত কালে। তখন গরমও প্রখর নয়, শীতও বেশি নয়। সেপ্টেম্বরে আবার ওই রকমের আর একটা কাল, শরৎ কাল। গ্রীষ্মের সেই ভীষণ গরম তখন কমে এসেছে। এর পরে আবার তো শীত আসার পালা।

এই ভাবেই তো বছর ঘুরে যায়, বছর ঘুরে আসে।

—